দ্বাদশ অধ্যায়

সামরিক শাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন (১৯৫৮ - ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ)

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শাসনব্যবস্থায় একধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া এর সাথে যুক্ত হয় সেনাবাহিনীর প্রভাব। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ক্রমেই বাড়তে থাকে। সেনাবাহিনী শাসন ক্ষমতা দখল করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ১৯৫৬ সালের ২৩এ মার্চ জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। তার সময়কালে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব রাখতে শুরু করে। ইস্কান্দার মির্জা নানাভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাঁধা সৃষ্টি করেন। তার ষড়যন্ত্রে কয়েকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পতন হয়। এদিকে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির দ্বন্দ্ব চরমে উঠে। একপর্যায়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে বিরোধী দল কৃষক-শ্রমিক পার্টির আক্রমণে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মাথায় আঘাত পেয়ে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট গোলযোগ ইস্কান্দার মির্জার পক্ষে সেনা শাসন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে সৃষ্ট পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং এর ফলাফল বর্ণনা করতে পারব;
- তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে ৬ দফার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ১১ দফা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিত ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব;
- দেশের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ে সচেতন হব।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি দেশের সংবিধান বাতিল করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙে দেন এবং মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয় সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে। মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। এর কিছুদিনের মধ্যে ২৭এ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। তিনি প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে এক অদ্ভুত ও নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন।

তাঁর এই নির্বাচনের মূলভিত্তি ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্র'। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে একধরনের সীমিত গণতন্ত্র, যাতে কেবল নির্দিষ্টসংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের আদেশ জারি করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি চার স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যন্ত স্তরগুলো ছিল: (১) ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে), (২) থানা পরিষদ (পূর্ব বাংলায়), তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা পরিষদ, (৪) বিভাগীয় পরিষদ। এই পরিষদগুলোতে নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য থাকত।

মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পাকিস্তানের উভয় অংশে ৪০০০০ করে মোট ৮০০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নিয়ে দেশের নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা মৌলিক গণতন্ত্রী বা বিডি মেম্বার ছিল। জনগণের মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন করা ছাড়া কোন দায়িত্ব ছিল না। বিডি মেম্বার ছিল প্রকৃত নির্বাচক। তারাই প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করতেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান ১৯৬০ সালে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও লাভ করেন। ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ নতুন সংবিধান ঘোষণা করা হয় এবং ৮ই জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়।

একক কাজ ঃ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের একটি ধারণা কাঠামো প্রস্তুত কর

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন

১৯৬২ সালের ৩০এ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দিকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এ খবর পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ছাত্ররা সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১লা ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট ডাকে এবং মিছিল বের করে। একনাগাড়ে ৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্মঘট চলে। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ৭ই ফেব্রুয়ারি সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। ছাত্রদের ওপর পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড় ও নির্যাতন শুরু হয়। ১লা মার্চ আইয়ুব খান নতুন সংবিধান ঘোষণা দিলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ-সমাবেশ ও ক্লাস বর্জন করে। ছাত্রদের সংবিধান বিরোধী এ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, রাজনীতিবিদদের অনেকে সমর্থন ব্যক্ত করেন। আইয়ুব খান ও পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনায়েম খান ছাত্রদের ওপর কঠোর দমন নীতি চালায়।

১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরিফ কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। এ প্রতিবেদনের সুপারিশে ছাত্রদের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে কঠোর আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৫ই আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত এবং কয়েক শত আহত হয়। এ আন্দোলনের ফলে শরিফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে ছাত্ররা আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়।

১৯৬২ সালের ৮ই জুন সামরিক আইন স্থগিত করা হলে দলীয় রাজনীতির অধিকার ফিরে আসে। আইয়ুব খান নিজেই কনভেনশন মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এসময় সোহরাওয়ার্দি সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে আইয়ুব বিরোধী মোর্চা গঠনের আহ্বান জানান। ফলে আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এন.ডি.এফ গঠিত হয়। এ ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। খুব তাড়াতাড়ি এ ফ্রন্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দি ইন্তেকাল করেন। ১৯৬৪ সালের শুরুতেই আওয়ামী লীগ এন.ডি.এফ. থেকে বেরিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নতুন যাত্রা শুরু হয়। এর ফলে এন.ডি.এফ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানবিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে একটি জোট বা COP (Combined Opposition Party) গঠন করে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে কপ-এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়। নির্বাচনে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পূর্ব থেকেই আইয়ুব খান নিজের অনুকূলে নিয়ে আসেন। জনগণ ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ করে। কিন্তু নির্বাচনে আইয়ুব খান জয়ী হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। সেখানেও আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান জন্ম নিলে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে বৈরিতার সূত্রপাত হয়। ভারত ও পাকিস্তান- উভয়ই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। ১৯৪৭ সালেই তাদের মাঝে কাশ্মীর নিয়ে প্রথম যুদ্ধ বাধে। কিন্তু জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে তার অবসান হয়। কাশ্মীরকে নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে ১৯৬৫ সালে। আইয়ুব খানের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল ভারত আক্রমণ করে কাশ্মীর দখল করা। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীরী নেতা শেখ আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করা হলে ভারতের কাশ্মীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আইয়ুব এ সুযোগ গ্রহণ করেন। প্রথমে সশস্ত্র গেরিলাদের কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করিয়ে গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। অবশেষে ৬ আগস্ট পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতীয় বাহিনী প্রাধান্য দেখিয়ে লাহোরের দিকে এগিয়ে যায়। পাকিস্তানিদের এই চরম দুর্দিনে বাঙালি সেনারা অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ করে লাহোর রক্ষা করে। পাকিস্তানের শোচনীয় অবস্থার মুখে পাশ্চাত্য শক্তি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপে ১৭ দিনের মাথায় যুদ্ধ বন্ধ হয়। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্য দিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান হয়।

এ যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী চেতনা প্রবল ভাবে জাগ্রত হয়। কারণ যুদ্ধে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। অরক্ষিত এ অঞ্চল যেকোনো সময় ভারতের আক্রমণের শিকার হতে পারত। এমনকি এ সময় প্রশাসনিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের যোগযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাঙালি সেনারা জীবন বাজি রেখে লাহোর রক্ষা করলেও আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেননি। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যসংকট দেখা দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অত্যধিক বেড়ে যায়। ফলে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতাসহ পূর্ব পাকিস্তানের দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়, যার প্রতিফলন দেখা যায় ছয় দফা আন্দোলনে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু, লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতি অনুযায়ী পূর্ব বাংলা পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়নি। দীর্ঘ ২৪ বছর পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়।

এসময় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে। এরই প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করে পশ্চিম পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়। লাহোর প্রস্তাবে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হলেও পাকিস্তানি শাসকরা প্রথম থেকেই এ বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করে। গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের মাধ্যমে তারা দেশ শাসন করতে থাকে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের ওপর উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শোষণ চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধি ঘটায়। বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর দমন, নিপীড়ন চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ অচল করে রাখে। বারবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাংলার জাতীয় নেতাদের অন্যায়ভাবে জেলে বন্দী করে রাখে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় বাঙালি প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল খুবই কম। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দিতে অনীহা প্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত সরকারকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করে। পরবর্তী মন্ত্রিসভাগুলোকে বারবার ভেঙে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য অচল করে রাখে। অবশেষে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়।

প্রশাসনিক বৈষম্য

পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি ছিল সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণ। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের মন্ত্রণালয়গুলোতে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার ৯৫৪ জনের মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ১১৯ জন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২০০০ কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল মাত্র ২৯০০। ১৯৪৭ সালে করাচিতে রাজধানী হওয়ায় সরকারি অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যাপক হারে চাকরি লাভ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল উচ্চপদে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সরকারের সব দপ্তরের সদর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বাঙালির পক্ষে সেখানে গিয়ে চাকরি লাভ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৫৬ সালে পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালি ছাত্রদের সাফল্য সহজ ছিল না।

সামরিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক শাসনের আরেকটি ক্ষেত্র ছিল সামরিক বৈষম্য। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য। প্রথম থেকেই সামরিক বাহিনীর শীর্ষ পদ পাঞ্জাবিরা দখল করে রেখেছিল। তারা বাঙালিদের সামরিক বাহিনী থেকে দূরে রাখার নীতি গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনীর নিয়োগের ক্ষেত্রে যে কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাতে ৬০% পাঞ্জাবি, ৩৫% পাঠান এবং মাত্র ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারণ করা হয়। বাঙালির দাবির মুখে সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও তা ছিল নগণ্য। ১৯৫৫ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, সামারিক বাহিনীর মোট ২২১১ জন কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ৮২ জন। ১৯৬৬ সালে সামরিক বাহিনীর ১৭ জন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১ জন ছিল বাঙালি। আইয়ুব খানের শাসনামলে মোট বাজেটের ৬০% সামরিক বাজেট ছিল। এর সিংহভাগ দায়ভার বহন করতে হতো পূর্ব পাকিস্তানকে, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার প্রতি অবহেলা দেখানো হতো।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক ভয়াবহ বৈষম্যের শিকার হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তান কখনও অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের সকল আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে সহজেই সকল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল। উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় পশ্চিম পাকিস্তানে জমা থাকত বিধায় পূর্ব পাকিস্তানে কখনও মূলধন গড়ে ওঠেনি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল পরিকল্পনা প্রণীত হতো কেন্দ্রীয় সরকারের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি না থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমটিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি, দ্বিতীয়টিতে বরাদ্দ ছিল ৯৫০ কোটি রুপি এবং ১৩৫০ কোটি রুপি। তৃতীয়টিতে পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে ৩৬% ও ৬৩%। রাজধানী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বেশিরভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। ১৯৫৬ সালে করাচির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় ৫৭০ কোটি টাকা, যা ছিল সরকারি মোট ব্যয়ের ৫৬.৪%। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের মোট সরকারি ব্যয়ের হার ছিল ৫.১০%। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইসলামাবাদ নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হয় ৩০০ কোটি টাকা, আর ঢাকা শহরের জন্য ব্যয় করা হয় ২৫ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানের কাঁচামাল সস্তা হলেও শিল্প-কারখানা বেশিরভাগ গড়ে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে কিছু শিল্প গড়ে উঠলেও তার অধিকাংশের মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। ফলে শিল্প ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে নির্ভরশীল থাকতে হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উপর। পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বর্ণ এবং টাকা-পয়সা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে কোনো বাঁধা ছিল না। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বর্ণ ও টাকা-পয়সা পূর্ব পাকিস্তানে আনার উপর সরকারের বিধিনিষেধ ছিল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষা ক্ষেত্রেও বাঙালিরা বৈষমের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা মনে-প্রাণে চেয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি যেন শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকে। অথচ তারা পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার উন্নয়নের কোন চেষ্টাই তারা করেনি। এছাড়া বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম করা বা আরবি ভাষায় বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থায় আঘাত হানতে চেয়েছিল। শিক্ষা খাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্য দেখানো হয়। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শিক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ২০৮৪ মিলিয়ন রুপি এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭৯৭ মিলিয়ন রুপি। পাকিস্তানের সর্বমোট ৩৫টি বৃত্তির ৩০টি পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান এবং মাত্র ৫টি বরাদ্দ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।

সামাজিক বৈষম্য

রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুবিধা ভোগ করত। সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক সুবিধা বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানিরা পেত। ফলে সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত ছিল।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

দুই অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬%। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল হাজার বছরের পুরনো। অপরদিকে ৪৪% জনসংখ্যার পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। উর্দুভাষী ছিল মাত্র ৩.২৭%। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষা ও সুসমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা। প্রথমেই তারা বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এবং বাংলা ভাষাকে আরবি বর্ণে লেখানোর ষড়যন্ত্র শুরু করে। বাঙালি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য। বাঙালি সংস্কৃতিতে আঘাত হানার জন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রচনাবলি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে হিন্দু প্রভাব বলে উল্লেখ করে সেখানেও বাধা দানের চেষ্টা করা হয়।

দলীয় কাজ ঃ সামরিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যের লেখচিত্রে প্রকাশ কর।

ছয় দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল, ছয় দফা দাবি আদায়ের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করা। মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা ও সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতারা একটি সম্মেলনের আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু লাহোর পৌঁছান। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' প্রস্তাব পেশ করলে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ তা প্রত্যাখ্যান করেন। বঙ্গবন্ধু সম্মেলন বর্জন করেন এবং ছয় দফা সাংবাদিকদের সামনে প্রকাশ করে ঢাকায় ফিরে আসেন। একুশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয়-দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে হবে। এটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা হবে সার্বভৌম।

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩. ক. দেশের দুই অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময় যোগ্য দুটি মুদ্রা চালু থাকবে। মুদ্রা লেনদেনের হিসাব রাখার জন্য দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে। মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

ঢাকার রাজপথে ছয়দফার পক্ষে মিছিল

অথবা

খ. দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে, তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মুদ্রা ও মূলধন পাচার হতে না পারে। একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুইটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪. সকল প্রকার কর ও শুল্ক ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এ দ্বারা ফেডারেল সরকার ব্যয় নির্বাহ করবে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে প্রদেশগুলো যুক্তিযুক্ত হারে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রদেশগুলো নিজস্ব মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

১৩ই মার্চ, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দেন। তিনি ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করেন। ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে উঠে। আইয়ুব সরকার তাতে আতঙ্কিত হয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় শুরু করে। আইয়ুব খান এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে এসে বিভিন্ন জনসভায় ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বলে আখ্যা দেন। দিনে দিনে ছয় দফার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুকে ১৯৬৬ সনের ৯ই মে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ই জুন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় মিছিলে পুলিশের গুলিতে অনেক লোক প্রাণ হারায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ৮ই জুন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত করে ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু করে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নির্বাচনের মূল ইস্তেহার। এ নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে নিরঙ্কুশ

বিজয় অর্জিত হয়। তথাপি ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য), ১৯৬৮

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। জনমানুষের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অধিক সম্পৃক্ততা তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের জননেতায় পরিণত করেছিল। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড রুদ্ধ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান সরকার বারবার তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে। তারপরও বঙ্গবন্ধুকে এ ভূখণ্ড স্বাধীন করার প্রচেষ্টা থেকে রিবত রাখা যায়নি। বিভিন্ন সময় বঙ্গবন্ধুর সাথে নানা পেশার, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর তরুণ বাঙালি সদস্যদের যোগাযোগ হয়। একপর্যায়ে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন একদল সেনাসদস্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। তাঁদের সাথে বঙ্গবন্ধুর সশস্ত্র আন্দোলন নিয়ে মতবিনিময় হয়। ১৯৬৩ সালে বঙ্গবন্ধু গোপনে ত্রিপুরা গমন করেন। সেখানে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা ও পরবর্তীকালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে তাঁর বৈঠক হয়। সেখানে তিনি শচীন্দ্রলালের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে বার্তা পাঠিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনে সহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন জনমানুষের দাবিতে পরিণত হয়। এদিকে সামারিক বাহিনীতে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণে কয়েকজন বাঙালি অফিসার ও সেনাসদস্য গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য সংগঠিত হতে থাকেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সমগ্র পাকিস্তানে দেড় হাজার বাঙালিকে গ্রেফতার করা হয়। এ ষড়যন্ত্রের জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। তখন বঙ্গবন্ধু জেলে বন্দী ছিলেন। এ মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য মামলাটির নাম হয় 'আগরতলা মামলা'। সরকারি নথিতে মামলার নাম হলো 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'।

১৯৬৬ সালের ৯ই মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে সামরিক আইনে জেলগেট থেকে আবার গ্রেফতার করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এ মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন ৩৫ জন। বঙ্গবন্ধুর সাথে অভিযুক্ত অন্য ৩৪ জন হলেন লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, এল.এস. সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ, নূর মোহাম্মদ, আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, এ.বি.এম. আবদুস সামাদ, হাবিলদার দলিল উদ্দিন হাওলাদার, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, ভূপতি ভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী), বিধান কৃষ্ণ সেন, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, হাবিলদার মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এ.বি.এম. খুরশিদ, খান শামসুর রহমান সিএসপি, রিসালদার এ.কে.এম. শাসসুল হক, হাবিলদার আজিজুল হক, মাহফুজুল বারি, সার্জেন্ট সামসুল হক, মেজর ডা. শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আবদুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন শওকত আলী, ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এ.এস.এম. নুরুজ্জামান, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিল, মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট এম.এম.এম. রহমান, সুবেদার এ.কে.এম. তাজুল ইসলাম, মো. আলী রেজা, ক্যাপ্টেন ডা. খুরশিদ উদ্দিন আহম্মেদ ও লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ।

আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯এ জুন বেলা এগারোটায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয়। সাক্ষির সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষে ১১ জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন। প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্ত আইনজীবীদের নিয়ে একটি ডিফেন্স টিম গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙালিরা ব্রিটেনের স্যার টমাস উইলিয়াম এমপিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করে। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌঁসুলি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেল টি. এইচ. খান। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি

ছিলেন এস এ রহমান। অপর দুই বিচারপতি ছিলেন এম আর খান ও মুকসুমুল হাকিম। ২৯এ জুলাই ১৯৬৮ সালে মামলার শুনানি পুনরায় শুরু হয়। স্যার টমাস উইলিয়াম ৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন।

বিচারকার্য চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের গণ-বিক্ষোভ ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে এসে গণ-অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (DAC) গঠন করা হয়। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকাবাসী প্রচন্ড ক্রোধে গর্জে উঠে। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে জনতা রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল হয়ে উঠে। পরিস্থিতি শান্ত করতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯এ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করেন। সেখানে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত ছিলেন। আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুর যোগদানের জন্য তাঁকে প্যারলে মুক্তিদানের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মাওলানা ভাসানীসহ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করার দাবি জানায়। অবশেষে আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে নতিস্বীকার করে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। বঙ্গবন্ধুসহ মামলার সকল অভিযুক্ত ২২এ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে মুক্তি লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষে পরদিন ২৩এ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সেই বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আগরতলা মামলার গুরুত্ব

বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফূরণে এই মামলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যে উদ্দেশ্যে আইয়ুব সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করেছিল তা আদৌ সফল হয়নি, বরং এটি আইয়ুব সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়। এ সময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী এগিয়ে আসেন এবং বাঙালি স্বার্থের মুখপাত্র ও আত্ম অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে স্বীকৃত হন।

১১ দফা আন্দোলন

১৯৬৮-৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এ সময়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলে আন্দোলনের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, যা গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারি ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ) কার্যালয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া ও মেনন গ্রুপ) এবং ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে ডাকসুর তৎকালীন সহসভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন কর হয়।

এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি নিয়ে গণ-অভ্যুত্থানের ডাক দেয়। এ কর্মসূচি শুধু ছাত্রদের নয়, আপামর জনগণের আন্দোলনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। ১১ দফা দাবির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দাবির মধ্যে ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি প্রদান, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, জরুরি আইন, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ, অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তি ইত্যাদি।

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা একসময় ছড়িয়ে পড়ে শহর ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মাঝে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে

উঠে এক দুর্বার আন্দোলন, যা ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষ প্রথমবারের মতো একসাথে আন্দোলনে নামে। পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠে। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টিতে সেগুলো প্রত্যক্ষ প্রভাব রেখেছিল। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ৬ই ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি যৌথ কর্মসূচি হিসাবে পল্টন ময়দানে একটি জনসভার আয়োজন করে। জনসভার পর একটি বিরাট মিছিল গভর্নর হাউস ঘেরাও করে। সেখানে মিছিলকারীদের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হলে মওলানা ভাসানী ঢাকা শহরে হরতাল আহ্বান করেন। ৮ই ডিসেম্বর প্রধান বিরোধী দলগুলোর ডাকে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১০ই ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ২৯এ ডিসেম্বর ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়রি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া ও মেনন গ্রুপ), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১ দফা দাবি পেশ করে। অচিরেই ১১ দফা দাবিকে আপামর বাঙালি সমর্থন প্রদান করে। ঊনসত্তরের উত্তাল সময়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এই ১১ দফা দাবি ছিল খুবই সময়োপযোগী। ফলে দ্রুত এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক) নামক মোর্চা গঠন করে এবং ৮ দফা দাবি পেশ করে।

এরপর থেকে 'ডাকসু' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠে। ডাকসু-এর আহ্বানে ১৪ই জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১৮ই জানুয়ারি পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট পালন করে। ধর্মঘট চলাকালীন পুলিশের সাথে ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ২০এ জানুয়ারি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালন করে। হরতাল পালনকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে নিহত হন। আসাদের হত্যার প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে সারা দেশে হরতাল চলাকালে সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক ঢল নামে। মানুষের অংশগ্রহণে আন্দোলন যেন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ ছাত্রনেতা আসাদ

আবারও পুলিশের গুলিতে নবম শ্রেণির ছাত্র কিশোর মতিউর নিহত হয় এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়। এরপর ক্ষিপ্ত জনতা সরকারি পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঢাকা শহর সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ২৪এ জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে বহু মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। জহুরুল হকের হত্যার প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারি আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিকেলে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা

দেন, 'দুমাসের মধ্যে ১১ দফা বাস্তবায়ন ও রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। প্রয়োজন হলে ফরাসি বিপ্লবের মতো জেল ভেঙে মুজিবকে মুক্ত করে আনব।' অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে।

১৮ই ফেব্রুয়ারির পর থেকে আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। অবশেষে আইয়ুব খান বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করলে নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। আইয়ুব খান বুঝতে পারেন, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও অভিযুক্তদের মুক্তি না দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। গণ- অভ্যুত্থানের চাপে তিনি একুশে ফেব্রুয়ারি ঘোষণা দেন, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হবেন না।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির পর ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। ২৩এ ফেব্রুয়ারির সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু ১১ দফা দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি দেন। ২৬এ ফেবুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রশ্নে অটল থাকেন। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা বারবার ব্যর্থ হতে থাকে। পুরো দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৯০ জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ই মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। ২২এ মার্চ আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে অপসারণ করেন। তাতেও গণ-আন্দোলন থামানো যায় নি। ২৫এ মার্চ আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে গ্রাম ও শহরের কৃষক ও শ্রমিকদের মাঝে শ্রেণি চেতনার উন্মেষ ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. কে পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন?

ক. মুহম্মদ আলী জিন্নাহ খ. ইস্কান্দার মির্জা

গ. আইয়ুব খান ঘ. মালিক ফিরোজ খান

২. আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কারণ-

i. দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সোহরাওয়ার্দিকে গ্রেপ্তার

ii. ছাত্রদের উপর পুলিশি নির্যাতন

iii. আইয়ুব খান কর্তৃক নতুন সংবিধান ঘোষণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অগ্রণী ক্লাবের সভাপতির একরোখা মনোভাব ও অসহযোগিতামূলক কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ক্লাবের সদস্যগণ। মারুফ সাহেবের নেতৃত্বে সদস্যগণ তাঁদের দাবি-দাওয়া সভাপতির নিকট পেশ করেন। সভাপতি ও তাঁর পক্ষের লোকজন বিষয়টিকে অযৌক্তিক মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মারুফ সাহেব ও তার অনুসারী সদস্যবৃন্দ সোচ্চার হন।

৩. মারুফ সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপে কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়?

ক. ছয় দফা দাবি উত্থাপন
খ. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন
গ. আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন
ঘ. ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি গঠন

৪. উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই-

i. আইয়ুব সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে
ii. বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়
iii. বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে ধাবিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা	১১৯ জন	৯৫৪ জন
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা	২৯০০ জন	৪২০০০ জন
গেজেটেড কর্মকর্তা	১৩৩৮ জন	৩৭০৮ জন
নন গেজেটেড কর্মকর্তা	২৬৩১০ জন	৮২৯৪৪ জন

ক. ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কাকে COP এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়?

খ. মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামো কীরূপ ছিল?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ছকে পাকিস্তানি আমলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কোন্ ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত বৈষম্যই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের একমাত্র কারণ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. রফিক একটি চলচিত্র দেখছিল। ছবিতে একটি অঞ্চলের জনগণের সংগ্রামের ঘটনা দেখাচ্ছিল। ঐ অঞ্চলের জনগণের সাহস, বুদ্ধি ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সরকারের একপেশে নীতির কারণে সংসদে তাদের কোন প্রতিনিধি নেই। তারা চাকরি, শিক্ষা ও অর্থনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত। তাদের বঞ্চনা ও শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন এক আপোষহীন নেতা। তিনি জণগণের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, পরিচালনার ক্ষমতা প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক আইন সভা গঠন, রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা– ইত্যাদি উক্ত অঞ্চলের হাতে দেওয়ার দাবি জানান।

ক. কার মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ-বিরতি সাক্ষরিত হয়?

খ. মতিউর হত্যার প্রেক্ষাপট কী ছিল?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার দাবিনামায় বঙ্গবন্ধুর কোন কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কী মনে কর উক্ত দাবিনামা বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল? যুক্তি দাও।